ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় নারী

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

উনিশ শতকের শেষভাগে, বিশেষ করে বাংলাদেশে যেসব মনীষিবৃন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল—যাঁদের অপূর্ব আত্মত্যাগ আজও আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাঁরা সকলেই ছিলেন সিস্টার নিবেদিতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তিনি বিদেশিনী হলেও, এদেশে তাঁর নবজন্ম। ভারতকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করে তারই সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অন্যান্য মনীষিদের মতো তাই তাঁর জন্মবার্ষিকীও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালনীয়।

আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষত নারীসমাজে নিবেদিতার অবদান কতখানি আজ তা গবেষণার বিষয়। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করি: ''ভগিনী নিবেদিতা যে সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনটারই আয়তন বড় ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র।... যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না।... এইজন্যই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন এক কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মতো একেবারেই নহে।''[১]

প্রকৃতপক্ষে, নিবেদিতার সব কাজই ছিল নীরবে। মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্যও তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা আকারে বড় ছিল না। বলা যায়, মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন অগ্রদূত। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে এক পত্রে লিখেছিলেন (২৯ জুলাই ১৮৯৭): ''ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন।'' তাঁর এই আহ্বান নিবেদিতার অন্তর স্পর্শ করেছিল। স্বদেশ, স্বজন, প্রতিষ্ঠা—সব বিসর্জন দিয়ে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। নারীজাতির মুক্তিসাধন হবে শিক্ষার সম্প্রসারণের দ্বারা, আর সে-শিক্ষা হওয়া চাই সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে। বাগবাজার পল্লির সংকীর্ণ গলিতে নিবেদিতা তাঁর বিদ্যাপীঠ স্থাপন করলেন। সেযুগে হিন্দুসমাজ, বিশেষ করে মেয়েরা কতদূর রক্ষণশীল ছিল তা সহজেই কল্পনা করা যায়। নিবেদিতা স্পর্শ বাঁচিয়ে দূর থেকে শিক্ষাদান করেননি। ইংরেজপল্লি চৌরঙ্গি অঞ্চল পরিত্যাগ করে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন অপরিচ্ছন্ন নেটিভ পাড়ায়। উদ্দেশ্য, পল্লীর অধিবাসিনীদের সঙ্গে একাত্মতালাভ।

নিবেদিতা সর্বদাই নানা কাজে ব্যাপৃত থাকতেন।

মনে বিস্ময় জাগে কীভাবে একজনের পক্ষে এত কাজ করা সম্ভব ছিল। নিজের বই লেখা, স্বদেশি ও বিদেশি কাগজে, বিশেষ করে 'মডার্ন রিভিউ'-তে বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা, শিল্পবিষয়ক সমালোচনা, নানা স্তরের লোকের সঙ্গে দেখাশোনা, কথাবার্তা এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা সফর। বাস্তবিক সবগুলির তালিকা দেওয়াও সম্ভব নয়।...

এইসব নানাধরনের কাজকর্মের মধ্যেও নিবেদিতা কখনও বিস্মৃত হননি যে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে এদেশের মেয়েদের কাজের জন্যই বিশেষভাবে আহ্বান করেছিলেন।

১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ১৬ নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন। স্বামীজী ও কয়েকজন গুরুভ্রাতা ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে স্বামীজীর সঙ্কলিত একটি মহৎ কার্যের সূচনা হয়।

১৮৯৮ নভেম্বর থেকে ১৮৯৯ জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিবেদিতার বিদ্যালয়ের কাজটি ছিল পরীক্ষামূলক। বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হন। অতঃপর প্রয়োজন অর্থের। সে-কারণে স্থির হয় তিনি বিদেশযাত্রা করবেন অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। স্বামীজীর উপদেশ বা পরামর্শও এইরূপ ছিল। তিনিও নিজে স্বাস্থ্যলাভের জন্য পুনরায় আমেরিকা যাত্রার কথা ভাবছিলেন। এইভাবে সামান্য সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করে নিবেদিতাকে একাকী ফেলে যাওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেননি।

আমেরিকায় নিবেদিতা নানাভাবে বক্তৃতাদির দ্বারা অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন। ওই কাজের জন্য তিনি 'The Project of the Ramakrishna School for Girls' নামে একটি আবেদনপত্রও প্রকাশ করেছিলেন। এ-বিষয়ে স্বামীজীর যেসব পাশ্চাত্য শিষ্যেরা তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লেগেট দম্পতি ও মিসেস বুল। ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে স্বামীজী ভারতের উদ্দেশে রওনা হন। নিবেদিতা কিন্তু আমেরিকাতেই থেকে যান এবং তাঁর পত্রগুলি থেকে জানা যায় ওই কালে বিশেষভাবে ভারতের স্বাধীনতালাভের সংগ্রাম তাঁর সমগ্র চিত্ত অধিকার করে।

অবশেষে ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তন। এবার ১৭ নং বোসপাড়া লেনে। সরস্বতীপূজার পর পুনরায় বিদ্যালয়ের কার্য শুরু হয়। ১৯০২, ৪ জুলাই স্বামীজীর মহাপ্রয়াণে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন। ওই সময়ে বিদ্যালয়ের কাজে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি। তখন তাঁর পাশ্চাত্য সঙ্গিনী বেট বিদ্যালয়ের দেখাশোনায় সাহায্য করতেন। বিশেষ করে, যখন তিনি বক্তৃতা সফরে যেতেন, বেটের উপরেই বিদ্যালয়ের কার্যভার থাকত। ১৯০৩ সালে বক্তৃতা সফরের পর তিনি বিদ্যালয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। ইতিমধ্যে স্বামীজীর অন্যতম শিষ্যা ক্রিস্টিন ভারতে এসেছিলেন ১৯০২ সালে। তিনিও ওই বছরের শেষে নিবেদিতার সঙ্গে যোগদান করেন। বস্তুত তিনি সাহায্য করায় বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

নিবেদিতা ১৯০২ সালের নভেম্বরে নিজের গৃহে কথকতা ও চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করেন। সেইসূত্রে অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। সিস্টার ক্রিস্টিন আসার পর অন্তঃপুরের বয়স্কা মহিলাদের জন্য 'পুরস্ত্রী বিভাগ'টি সামান্যভাবে আরম্ভ করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৪ সালে জগদ্ধাত্রীপূজার দিন বিকালে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়রূপে প্রথম এই 'পুরস্ত্রী বিভাগে'র শুরু। এই বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে ক্রিস্টিনের পরিচালনাধীন ছিল।

নিবেদিতা তাঁর অজস্র কর্মের মধ্যেও বিদ্যালয় পরিচালনার ভার বহন করতেন। অসাধারণ বিদুষী

হয়েও ওই বিদ্যালয়ের অজ্ঞ ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষা দিতেন ধৈর্যের সঙ্গে। সরলাবালা সরকারের লেখা 'নিবেদিতাকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে তার একটি চমৎকার রেখাচিত্র পাওয়া যায়।

ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী, বুঝেছিলেন বিদেশি শিক্ষার অনুকরণ দ্বারা শিক্ষার যথার্থ ফললাভ অসম্ভব। জাতীয় আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। তাঁর মতে, ''ভারতীয় নারীদের জন্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন, যার লক্ষ্য হবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহযোগিতায় বিকাশসাধন।" নিবেদিতা দৃঢ়তার সঙ্গে 'Hints on National Education in India' গ্রন্থে বলেছেন : ''অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতই বিশেষভাবে মহীয়সী নারীকুলের জন্মদাত্রী। ইতিহাস, সাহিত্য যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্বত্র তাঁহাদের মহিমময় মূর্তি উদ্ভাসিত।... ভারতের ইতিহাস এবং সাহিত্যে নারীত্বের যে আদর্শ বিরাজমান, যে শিক্ষা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই আদর্শকে উচ্চ স্থান না দেয়, তা কখনই ভারতীয় নারীদের প্রকৃত শিক্ষারূপে পরিগণিত হতে পারে না।"

নিবেদিতা ভালবেসেছিলেন এদেশের মেয়েদের। তাদের পারিবারিক জীবন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ভারতের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা সফর উপলক্ষে অন্যান্য প্রদেশের মেয়েদের সংস্পর্শে এলেও তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ। বাংলার মেয়েদের জন্য তিনি কী করেছিলেন তার নির্দিষ্ট তালিকা দেওয়া কঠিন। তাদের সুখদুঃখ তিনি নিজের বলে গ্রহণ করেন। কেবল তাই নয়, এদেশের নারীর অবস্থা তখন অতি হীন। বিশ্বের চোখে তারা করুণা ও অবজ্ঞার পাত্রী। 'The Web of Indian Life' এবং অন্যান্য পুস্তকে এদেশের নারী সম্বন্ধে তাঁর রচনাগুলি বিস্ময়কর। নারী শুধু জননী ও পত্নী নয়, জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার রক্ষয়িত্রী। তাই তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ বা অসৌজন্য প্রকাশ তিনি সহ্য করতেন না। তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় মেয়েদের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত। একজন ইংরেজ নারী কর্তৃক সেযুগে বিশ্বের দরবারে এদেশের নারীচরিত্রের উচ্চ আদর্শ, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের পরিচয় প্রদানের গুরুত্ব আজকের দিনে যথার্থ অনুভব করা কঠিন। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিবেদিতা প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ : ''ভারতীয় নারীগণ অশিক্ষিত ও অত্যাচারিত, এই অভিযোগ কোনওক্রমেই সত্য নয়। অন্যান্য দেশের চেয়ে এখানে নারীজাতির প্রতি অত্যাচার কম। ভারতীয় নারীর মহৎ চরিত্র তার জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আধুনিক অর্থে তারা অজ্ঞ বটে, অর্থাৎ লিখতে প্রায় কেউই পারে না; অক্ষরপরিচয়ও অতি অল্প স্ত্রীলোকের আছে। কিন্তু তাই বলে কি তারা অশিক্ষিত? যদি তাই হয়, তবে যেসব মা, ঠাকুরমা, দিদিমা ছেলেমেয়েদের কাছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও নানা উপাখ্যান বর্ণনা করেন, তাঁদের সকলকেই অশিক্ষিত বলা যেতে পারে। আবার এঁরাই যদি ইউরোপীয় উপন্যাস এবং কতকগুলি বাজে ইংরেজি পত্রিকা পড়তে পারতেন, তবে আর অশিক্ষিত বলে অভিহিত হতেন না। এটা কি পরস্পরবিরুদ্ধ মনে হয় না?

''প্রকৃতপক্ষে, আক্ষরিক জ্ঞান সংস্কৃতির পরিচয় নয়। ভারতীয় জীবনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, ভারতীয় পারিবারিক জীবনের মূলকথা হল মহত্ত্ব, ভদ্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ধর্মশিক্ষা, হৃদয় ও মনের উৎকর্ষ। আর ভারতীয় নারীর মধ্যেই এই গুণগুলি বর্তমান। সুতরাং সে নিজের মাতৃভাষা পড়তে এবং নাম সই করতে না পারলেও, সমালোচকরা তাকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, এবং যথার্থ দৃষ্টিতে সে তার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত।"

প্রতিবেশিনী মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে নিবেদিতার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। বলা বাহুল্য, পাড়ার মধ্যে দুজন খাঁটি মেমসাহেব হিন্দু জীবনযাপন করছেন—এ-ঘটনাটি সকলের কাছেই ছিল বিস্ময়কর। তাঁর সাদর আহ্বানে কৌতূহলী মহিলার দল সহজেই সাড়া দিয়েছিলেন। অবসর পেলে সন্ধ্যার সময় তাঁরা নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের কাছে এসে বসতেন। এই মেলামেশা ও কথাবার্তার মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার ভাবটি বিশেষ লক্ষণীয়। লেডি অবলা বসু, লাবণ্যপ্রভা বসু, সরলা ঘোষাল প্রমুখ তদানীন্তন ব্রাহ্ম মহিলাগণ যেমন তাঁর সংস্পর্শে এসে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ঠিক তেমনভাবে অতিসাধারণ এবং নিম্নজাতীয় মেয়েরাও আপনার জ্ঞানে অকপটে তাঁর সঙ্গে ঘরকন্না ও সুখদুঃখের গল্প করত। তাদের সকল আপদে বিপদে নিবেদিতা ছিলেন পরমাত্মীয়া।

বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে নিবেদিতা শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের গৃহে বাস করেন। ওই সময়ে পল্লীবাসী সাধারণ দরিদ্র নরনারীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক মেলামেশা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই তিনি বলেন: ''ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটিরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমান রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।''[২]

কেবল প্রতিবেশিনীদের সঙ্গেই কি তাঁর যোগাযোগ ছিল? ১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের করুণ সংবাদ তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করে। তৎক্ষণাৎ নিবেদিতা ছুটে গিয়েছিলেন সেই বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে। নৌকা করে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তিনি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দরিদ্র ঘরের কৃষক মেয়েদের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ ও ঘরসংসারের কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। নিবেদিতা যেন তাঁদেরই একজন। তিনি যে তাদের প্রকৃত দরদি ও একান্ত হিতৈষিণী সে-বিষয়ে মুহূর্তের জন্য সংশয় ঘটেনি। তাই এক পল্লীতে মেয়েরা তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য নদীর তীর অবধি এসেছিল।

তাঁর বিদ্যালয়টি ছিল পাড়ার মেয়েদের আনন্দ নিকেতন। ক্ষুদ্র বালিকা থেকে আরম্ভ করে বর্ষীয়সী মহিলা পর্যন্ত সকলের সে-গৃহে অবাধ গতি ছিল; সকলেই ছিল তাঁর গুণমুগ্ধ। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে অভিভাবকদের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করে তিনি বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য মেয়ে সংগ্রহ করতেন এবং নানা কাজে উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকলেও স্বয়ং তাদের শিক্ষা দিতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর এই উদ্যম ও পরিশ্রম বহু সময়েই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত কারণ সেযুগে বাল্যবিবাহ প্রথা মেয়েদের শিক্ষালাভে অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রতিকূল ছিল। নিবেদিতা তাই পরে অন্তঃপুরিকাগণের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা করেন।...

আজ দেশের সর্বত্র বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রের (Adult School) ছড়াছড়ি। নিবেদিতা এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শিকা। বহু পূর্বে ১৯০৩ সালেই তিনি বয়স্কা মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় খোলেন। শিক্ষার্থিনী সকলেই ছিলেন প্রাচীনপন্থী পরিবারের কন্যা ও বধূ। তাই পর্দাপ্রথা অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সংস্কৃতি ও রীতিনীতি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে সম্পূর্ণ দেশীয় ঢঙে শিক্ষা দেওয়া। তিনি লিখেছেন (Hints on National Education in India, Vol II) : ''অতীতের হিন্দু নারীগণ কি আমাদের লজ্জার কারণ ছিলেন যে তাঁদের লাবণ্য ও মাধুর্য, নম্রতা ও ধর্মভাব, সহিষ্ণুতা ও শিশুসুলভ গভীর ভালবাসা এবং করুণা প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ বর্জন করে আমরা পাশ্চাত্য নারীর

বিবিধ তথ্যসংগ্রহ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের দুর্বার আগ্রহ—যা পাশ্চাত্য শিক্ষার অসংস্কৃত ফলমাত্র—তাই গ্রহণে ব্যগ্র হব?"

তাঁর শিক্ষাকার্য ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়। বিবাহোপযোগী বালিকা অপেক্ষা বিধবা ও বিবাহিতার সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এদেশের পারিবারিক জীবনের মূলে যে মমতাময়ী স্বার্থশূন্য নারী, নানাভাবে নিবেদিতা তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "পুরুষের শ্রদ্ধা, অন্তর্দৃষ্টি এবং মহত্ত্বের উৎস যে গৃহপরিবেশ, তা নারীর তপস্যার মধ্যেই নিহিত।"

তিনি লিখেছেন : "আমি এই দেশকে ভালবাসি যেখানে মহান হিমালয় পর্বতমালা চিরবিরাজমান—এই সেই দেশ যেখানে অন্তঃপুর জীবন সরল ও অনাড়ম্বর; যেখানে পারিবারিক সুখ সর্বাপেক্ষা অধিক, যেখানে নারীগণ নিঃস্বার্থভাবে, বিন্দুমাত্র আত্মপ্রচার না করে, অকুণ্ঠচিত্তে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে শিশিরস্নিগ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রিয়জনের সেবায় ব্যাপৃত থাকেন।"

তবে একথা মনে করা ভুল হবে যে নিবেদিতা অগ্রগতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, "পুরাতন প্রথার মধ্যে মেয়েরা কেবল শৃঙ্খলা নয়, জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করেছে।" কিন্তু তিনি জানতেন আধুনিক বিপ্লব কেবল ইউরোপীয় নয়, ভারতীয় সমাজেও যে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে তাকে উপেক্ষা করে পুরাতন প্রথা বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রগতির স্রোত তখন রক্ষণশীল পরিবারেও ক্রমবর্ধমান। তাই বিধবা ও বিবাহিতা মেয়েদের বাংলা সাহিত্য ও সূচীশিল্প শিক্ষার সঙ্গে তিনি ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন।

ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়ার সময় তিনি মনে করিয়ে দিতেন তারা ভারতবর্ষের কন্যা, ভারতের আদর্শই তাদের আদর্শ। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারীগণের উদ্দেশে বক্তৃতা ও প্রবন্ধে তিনি আকুল আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, যখন তারা দেশমাতৃকার চরণ স্পর্শ করে স্বামীপুত্রের সঙ্গে নিজ জীবন উৎসর্গের সংকল্প গ্রহণ করবে, তখনই কেবল ভারতজননী বিজয়মুকুটে ভূষিত হয়ে উন্নতশিরে বিশ্বসভায় দাঁড়াবেন। উত্তরকালে নিবেদিতার এই মহৎ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

নিবেদিতার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও বাংলার নারীজাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসার কিছু আভাস এইসব ঘটনার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। যেমন দেশের জাতীয় জাগরণে, তেমনি নারীজাগরণের মূলে তাঁর আত্মোৎসর্গ অবিস্মরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন ভারতে মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সময় আসন্ন। নরনারীনির্বিশেষে তিনি সেই পরিবর্তনে সহায়তার জন্য আহ্বান করেছিলেন। সেই উদাত্ত আহ্বানে সমগ্র নারীজাতির পক্ষ থেকে ভারতমাতার বেদিমূলে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন একমাত্র ভগিনী নিবেদিতা। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যা। পথপ্রদর্শিকারূপে তাই তিনি চিরদিন আমাদের প্রণম্যা।

নিবেদিতা ছিলেন এদেশের একাধারে ভগিনী, সেবিকা, বান্ধবী ও জননী। দেশ ও জাতির কল্যাণে তাঁর আত্মত্যাগের কাহিনি চিরদিন নারীজাতির কাছে প্রেরণা বহন করবে।

তথ্যসূত্র

১। *রবীন্দ্ররচনাবলী*, শতবার্ষিকী সংস্করণ, খণ্ড ১৩শ, পৃঃ ১৯৫
২। তদেব, পৃঃ ১৯৬-৯৭

নিবোধত, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।